এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
√ খেলতে খেলতে বিজ্ঞান
√ অঙ্কের মজা √ কৌতূহল
√ সংগঠন সংবাদ √ খবর

12

বিজ্ঞান অন্বেষক

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

বর্ষ -১ ষষ্ঠ সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর /২০০৪ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

বিষ-বিস্ময়

বিষ বলতেই বিষিয়ে ওঠে মন। ভয় এসে হাত ধরে। মৃত্যুর ভয়। আর সেই বিষ যদি হয় সাপের বিষ তাহলে তো সাপের দিকেই তর্জনী ওঠে আমাদের। আবার ভয় থেকেই ভক্তি চলে আসে। মানুষের স্বভাবই এই। আর সেজন্যই বোধ হয় সাপ নিয়ে এত রূপকথা, লোকগাথা, পাঁচালি ও গান, 'মনসামঙ্গল।' কিন্তু সাপ মাত্রই যে বিষধর নয়, একথা আমরা কজন জানি। বরং অবিশ্বাসে ভ্রূ কুঁচকে উঠে যদি বলি পৃথিবীতে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশি। আসলে আতঙ্কেই কখনো হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় কারো কারো। আর যত দোষ নন্দ ঘোষ—সাপের উপরেই পড়ে।

না সাপের সপক্ষে আমি গাওনা গাইছিনা। বলতে চাইছি যত গর্জে তত বর্ষে না। তা প্রায় ২৭০০ প্রজাতি সাপের মধ্যে ভারতবর্ষে মাত্র ৩০০ প্রজাতি বিষধর। আর ছয় থেকে নয় হাজার মানুষ ফি বছর সাপের বিষেই প্রাণ হারায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাপের বিষ আসলে কি, কি জিনিস দিয়ে তৈরি, জিনিসটাই বা কেমন। বিষ সাধারণত হাল্কা হলুদ, এক তরল যার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ জল, আর বাদ বাকীটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন, প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত পদার্থ এবং কয়েকটি অজৈব লবণ।

অথচ ঐ আপাত নিরীহ পদার্থগুলিই কত ভয়ঙ্কর, ভাবা যায় না। বিষগ্রন্থি থেকে বের হয়ে মুহূর্তে অসাড় অবশ করে দিতে পারে শিকারের শরীর। বিষগ্রন্থিটি আবার বেশ মোটা ও পুরু এক সংযোজক কলা দিয়ে তৈরি। আর আছে এক আলাদা সংকোচধর্মী পেশী এবং একটি নালিকা যা দুই চোয়ালের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে থাকে এক একটি ছোবলের অপেক্ষায়।

মোট তিনটিভাগে ভাগ করা যায় সাপের বিষেৰ মধ্যে প্রাপ্ত প্রোটিনের উপাদানগুলিকে। এগুলি হচ্ছে : (১) বিষযুক্ত প্রোটিন, (২) এনজাইম সক্রিয়তা সমৃদ্ধ প্রোটিন আর (৩) এমন প্রোটিন যার জৈব সক্রিয়তা এখনো অজানা।

এই বিষ কিভাবে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় এই বিষ আবার দুধরনের। প্রথমত: হেমোটক্সিক বিষ (রক্তনাশক বিষ)—এই বিষ সহজেই রক্ত আর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিতে পারে। সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড জ্বালা ধরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত: নিউরোটক্সিক বিষ (স্নায়ুনাশক)—যা প্রথমেই আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় ক্রমে যা ঠেলে দেয় অনিবার্য চূড়ান্ত পরিণতি—মৃত্যুর দিকে।

এমন অনেক সাপ আছে যারা একই সাথে হেমোটক্সিক এবং নিউরোটক্সিক বিষ উৎপন্ন করে। যদিও এর ভেতরে যেকোন একটির প্রভাব এবং সক্রিয়তা অন্যটির চেয়ে বেশি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা রাজ

এর পর ২ পাতায়

পাখিদের কথা

'কি করছিস লা টুনটুনি ?' একথাটা কে, কখন, কি মতলবে বলেছিল তা নিশ্চয় সঙ্কলের পড়া আছে বিখ্যাত সেই 'টুনটুনি ও বিড়াল' গল্পে। ছোট্ট লিক্‌পিকে এক টুনটুনি কত কৌশল করে দুষ্টু বেড়ালের হাত থেকে বাচ্চাদের বাঁচিয়ে বড় করে শেষে বেড়ালটিকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। তবে বাস্তবে টুনটুনি একটু বোকাও আছে। কারণ শত্রুকে দেখলে বাসা ছেড়ে হুটপাট করে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে হাঁকডাক শুরু করে দেয়, এতে বিড়ালজাতীয় শত্রুরা বাসা চিনে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সহজেই খপ্ করে ধরে নেয় ওদের। তবে টুনটুনিকে নেহাৎ বুদ্ধু ভাবাও ঠিক হবে না কারণ দরজি পাখি হিসাবে

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না

বিশ্বাস : মিষ্টি খেলে কৃমির সংক্রমণ ঘটে অথবা বৃদ্ধি হয়।

বিজ্ঞান : মিষ্টি খাওয়া বা না খাওয়ার সঙ্গে কৃমির সংক্রমণ বা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে কৃমির জীবনচক্র এবং তার পরিণতি। কৃমি একটি পরজীবী জীব। অর্থাৎ কৃমি অন্যের নির্ভরতায় বেঁচে থাকে। প্রতিটি জীবের মতো কৃমির

এরপর ৬ পাতায়

বিষাক্ত সেলফোন

যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা এখন আমাদের অভ্যেস এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমরা নিজেদের যুগোপযোগী করবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের দানগুলির ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছি। তার মধ্যে একটি হল মোবাইল ফোন। এখন আমরা বিশেষ করে শহর অঞ্চলে স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে কলেজের ছাত্র, অফিস যাত্রী সবার কাছে এই চলমান দূরভাষ যন্ত্রটি দেখে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে কোন অবাঞ্ছিত সময়ে বেজে উঠে বিরক্তি প্রদান করলেও এর সুফল থেকে আমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারি না। এর মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গিয়েছে যেন পুরোটা আমার

এর পর ৫ পাতায়

জীবাণু যুদ্ধ

সংবাদপত্রের দৌলতে জীবাণু যুদ্ধ আজকে অনেকের কাছেই পরিচিত শব্দ। জীবাণু যুদ্ধের মূল বিষয়টা হল অস্ত্র হিসাবে জীবাণু প্রয়োগ। অস্ত্র হিসাবে জীবাণু মারাত্মক। কারণ এ আঘাত করে সবার অলক্ষ্যে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে হানিবল শত্রুর জাহাজে মাটির পাত্রে ভরে বিষধর সাপ পাঠিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে জীবকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের শুরু এখান থেকেই। সময়ে সাথে

এরপর ৫ এর পাতায়

বিষ বিস্ময়

১ পাতার পর

গোখরো বা *'Ophiophagous hannah'*-র কথা বলতে পারি। এরা নিউরোটক্সিক বিষই তুলনায় বেশি ক্ষরণ করে। পাশাপাশি হিরের মত উজ্জ্বল পিঠের ঝুমঝুমি সাপ অর্থাৎ *Crotalus adamanteus* নামের সাপগুলি আবার হেমোটক্সিক বিষই তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষরণ করে।

সারা পৃথিবীতে সাধারণভাবে বিভিন্ন গণ এবং প্রজাতির সাপের বিষে প্রায় কুড়ি ধরনের বিষাক্ত এনজাইম পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে মোটামুটি এইরকম : অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টরেজ, লেসিথিনেজ অথবা ফসফোলাইপেজ —এ প্রোটিয়েজেস এস্টারেজ, ডাইপেপটাইডেজ, এল অ্যামাইনো এসিড অক্সিডেজ, ডি-অক্সি-রিবোনিউক্লিয়েজ, রাইবোনিউক্লিয়েজ, ফসফোডাই এস্টারেজ, ডি পি এন বিশ্লেষক এনজাইম, ৫ নিউক্লিওটাইডেজ, হায়ালুরোনিডেজ এবং ব্রাডিকাইনিন নিঃসরণশীল এনজাইম ইত্যাদি।

সাপের বিষের মারণক্ষমতার জন্য কিন্তু একটি মাত্র এনজাইমই এককভাবে দায়ী নয়, বরং এর দাবী অবশ্যই করতে পারে অনেকগুলি এনজাইমের সম্মিলিত কর্মক্ষমতা। এনজাইমের টিম ওয়ার্ক আর কি।

'বিষে বিষে বিষক্ষয়' বলে একটা কথা আছে বাংলায়। না সাপের বিষ প্রতিহত বা প্রশমিত করবার কথা বলছি না। আমাদের শরীরের ভেতরে গড়ে ওঠা কতরকমের রোগ যে সাপের বিষ থেকে আরোগ্যের পথ দেখেছে বা দেখতে পারে, তার কথাই বলছি। হাজার বছর ধরে সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়ে আসছে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের নিদান হিসেবে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় সেই আমলের বদ্যি কবিরাজরা এই সাপের বিষই ব্যবহার করতেন। খোলস ছাড়ার পর সাপ তার শরীরের ক্ষতগুলি দ্রুত সারিয়ে তুলতে জানে বলে মনে করতেন তাঁরা আর এই ক্ষমতাটাই নাকি মানব শরীরে চালান করে দিতে পারে ওই বিষ। এরকমই ধারণা ছিল তাঁদের। ভারতীয় আয়ুর্বেদ রাজরোগ অর্থাৎ যক্ষায় সাপের বিষের আরোগ্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, আজকাল তো আবার হৃদরোগ হতে পারে এমন সন্দেহজনক রোগীদেরও সাপের বিষ থেকে পাওয়া ওষুধ দেওয়া যেতে পারে কিনা এই নিয়ে ভীষণভাবে জল্পনা চলছে। কেননা ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে সাপের বিষ হচ্ছে এমন এক মিশ্রণ যেখানে আছে টক্সিন সহ বিভিন্ন এনজাইম যা রক্ত গহ্বরের দেয়ালগুলিকে হজম করে ফেলতে পারে অনায়াসেই, ফলে প্রাকৃতিক এই তঞ্চনবিরোধী উপাদানই রোগীর রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। গবেষকরা তাই প্রায় উঠে পড়ে লেগেছেন সম্ভাব্য সবরকম সাপের বিষ থেকেই এমন এক তঞ্চনবিরোধী ওষুধ তৈরি করতে যা সহজেই হৃদরোগ থেকে মানুষকে অব্যহতি দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, মালয়েশিয়ার পিট ভাইপার নামে এক ধরনের সাপের বিষ থেকে ANCROD নামে একটা থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ পাওয়া গেছে যা হৃদরোগ বা স্ট্রোক আক্রান্ত মানুষদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ৪২ শতাংশ মানুষকে আবার তাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা গেছে। সময়? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি স্ট্রোক হওয়ার পরে মাত্র তিন ঘন্টায়। ANCROD আসলে ফাইব্রিনোজেনের অর্থাৎ যা কিনা রক্ত জমাট বাঁধানোর প্রধান কলকাঠি, তার বিরুদ্ধেই কাজ করে বেশি অর্থাৎ রক্ত প্রবাহের মধ্যে ফাইব্রিনোজেনের স্তরটাকে অনেক নামিয়ে আনে। এই ওষুধটি ইউরোপে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে রক্ত সংবহন এবং পায়ে ও চোখে রক্তজমাট জনিত অসুখে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এসব ছাড়াও আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ সংস্থা অর্থাৎ FDA 'INTEGRILIN' নামে একটি ওষুধকে ইতিমধ্যেই 'হার্ট অ্যাটাকের' প্রতিষেধক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বলাবাহুল্য এই 'INTEGRILIN' আবার পাওয়া গেছে র‍্যাটল সাপের বিষ থেকে। কেবল হার্ট অ্যাটাকই নয়। বরং বুকের ব্যাথা এবং যেসব রোগীর হৃপিণ্ডের এখন তখন অবস্থা তাদের জন্যই এই 'INTEGRILIN' বেশি কার্যকরী।

টিউমারেও সাপের বিষের প্রয়োগ বিশেষ সুফল এনে দিয়েছে। এবং সুখবর এই যে স্তন ক্যানসারের বিরুদ্ধে সাপের বিষ হয়তো কখনো ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া অব মেডিসিনের প্রাণ রসায়ণ বিভাগের অধ্যাপক ফ্রান্সিস মার্কল্যান্ডের মতে 'সাদার্ন কপারহেড ভাইপার' নামক সাপের বিষ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ইঁদুরের শরীরে টিউমারের বৃদ্ধিকে কমিয়ে দিতে পারে। কমিয়ে দিতে পারে ৭৪ শতাংশ এর মতো স্তন ক্যানসার কোষের বাড়বাড়ন্ত। কনটরট্রোস্ট্যাটিন (CN) অর্থাৎ যে প্রোটিনটি সাপের বিষ থেকে পাওয়া গেছে তা মূলত: ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কোষগুলিকে ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচায়। উক্ত প্রোটিনটি ইঁদুরের যকৃতে প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। যদিও এই আশ্চর্য প্রোটিনটি টিউমারের কোষগুলিকে ধ্বংস করে না কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত 'ফ্রিজ' করে রাখতে সক্ষম। আর এবাবেই ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিও আটকে রাখা সম্ভব। ভালো কথা এই প্রোটিনটি আবার কেমোথেরাপির ওষুধের প্রতি একদম নিরপেক্ষ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন।

রক্ত জমাট সংক্রান্ত নির্ণায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে রাসেলস ভাইপারের বিষ। এর থেকে তৈরি করা হয়েছে এক জটিল এনজাইম সমৃদ্ধ বিকারক। কিডনির অসুখ, ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে জারারাকা পিট ভাইপারের বিষ। পার্কিনসন রোগ এবং অ্যালজাইমার্স রোগের প্রতিষেধক হতে পারে গোখরো সাপের বিষ।

অস্টেওপোরোসিস বা অস্থিক্ষয়েও ভাইপারের বিষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সব শেষে একটা কথা না বললেই নয় এবং সম্ভবত এটাই সবয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ আনন্দের যে সাপের বিষ থেকে 'অ্যান্টিভেনম' তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা 'সর্পাঘাত থেকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারবে সাপের ভয়ে ভীত হাজারো মানুষকে। সাপ 'শাপে বর হয়ে উঠবে।

—জগন্ময় মজুমদার
(শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র হাইস্কুল)

English Grammar Coaching Institute for Class IX - XII and Degree
Letter Marks Guarantee (Condition Apply) Pass Marks Guarantee (No Condition)
Contact : T. PAUL
Mob : 9831422719
Nabanagar, Halisahar, North 24 Parganas

টুনটুনি পাখি

১ পাতার পর

এর বেশ সুখ্যাতি আছে এছাড়া এরা বাসা বুনবার আগে শত্রুর নজরে পড়লেই বাসার উপকরণ ঠোঁট থেকে ফেলে দিয়ে অন্যত্র বাসা বুনবার সিদ্ধান্ত নেয়। আর বাসা যদি একটু দূরে থাকে তবে শত্রুর নজরে পড়ামাত্র বাসা তৈরির উপকরণ চট্ করে নিচে ফেলে দেয় এবং দূরে উড়ে চলে যায়। তারপর চুপচাপ থাকে অনেকক্ষণ যাতে শত্রুকে ফাঁকি দিতে পারে। বিপদ কেটে গেলে আবার ফেলে দেওয়া বাসা তৈরির উপকরণ ঠোঁটে তুলে নেয় এবং বাসার দিকে রওনা দেয়। এতে শত্রুরা বাসার ঠিকানা খুঁজে পায়না।

টুনটুনি : বাংলায় এরা টুনটুনি বা টুনি নামে এবং ইংরাজিতে Tailor bird বা Warbler নামে পরিচিত। এদের বিজ্ঞান সম্মত নাম *Orthotamus sutorius*। দেহের আকার চড়াইয়ের চেয়ে বেশ ছোটো, সোজা ঠোঁটটি সরু, দেহানুপাতে লেজটি লম্বা এবং বেশিরভাগ সময় দোয়েলের ভঙ্গিতে লেজটি উঁচুতে তুলে রাখে। এরা এত ছোট্ট যে এক হাতের মুঠোতে ৪/৫ টি পাখি অনায়াসে ধরা যাবে। ঠোঁটের রঙ ও হাড় জিরজিরে সরু পা অনেকটা চড়াইয়ের মত। গলা-বুক-পেট ও লেজের তলা সাদা এবং মাথা-ঘাড়-পিঠ-ডানা ও লেজের উপরিভাগ হালকা ধূসর সবুজ রঙের পালকে ঢাকা। চোখের রঙ লালচে। ডাকাডাকির সময় গলার দুপাশে মাছের কানকোর মত পালক ফাঁকা হয়ে যায়। বাসা তৈরির সময় পুরুষ টুনটুনির সবুজ রঙ বেশ খোলতাই হয় তবে অন্য সময় স্ত্রী-পুরুষ একইরকম দেখতে হয়। Muscicapidae গোষ্ঠীর এই পাখিরা বেশ চনমনে ছট্‌পটে। অস্থিরভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এডাল ওডাল করে বেড়ায়। তখন টুন-টুন, টিউ-টিউ কখনো বা টুইক্-টুইক্ শব্দে বিরামহীনভাবে কিছুক্ষণ ডাকতে থাকে তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। বিশেষত নির্জন দুপুরে বাড়ির উঠানে ঝোপেঝাড়ে এদের দেখা পাওয়া যাবেই। এরা দু-জনে বা দু-চার জনে, কদাচিৎ একা খাবার সন্ধানে ঝোপেঝাড়ে উঁকি মারে। একটা গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সব অংশ জরিপ করে তীক্ষ্ন নজরে। পাতার আড়ালে বা শুকনো ছাল-বাকলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গাছের ক্ষতিকারক পোকাগুলোকে একটা একটা করে বেছে শিকার করে ঠোঁট দিয়ে বড় হলে ডালে ঠুকে ঠুকে মেরে এবং ছোট হলে গপ্ করে গিলে নেয়। এরা পোকামাকড় ধরবার সময় বেশ কায়দা দেখায়। একবার যে গাছের ডালে খাবার সন্ধানে এসে বসে সে গাছ থেকে ছোট-বড় কীট-পতঙ্গ, যেমন, মাকড়সা, শুয়োপোকা, লার্ভা, ছোট্ট আরশোলা বিভিন্ন পোকার ডিম, পিপড়ের ডিম ইত্যাদি এমনকি ছোট্ট ছোট্ট বিছে, কেঁচো সব খায় এরা। গাছের স্বাস্থ্যরক্ষা তো করেই সেইসঙ্গে ফুলের পাপড়ির ফাঁকে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট ছোট্ট পতঙ্গ, মধু ইত্যাদি খেতে গিয়ে অজান্তে এরা গাছের বংশবিস্তারে সাহায্য করে। খাবার সন্ধানে মাটিতেও এরা নেমে পড়ে মাঝেমধ্যে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তিড়িং করে নিরাপদ উঁচু জায়গায় উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে লেজ উঁচিয়ে টুন-টুন করে চিল-চিৎকার শুরু করে দেয়, আপদ দূর হলেই তবে চুপ করে। দেখে বেশ মজা লাগে—ঢাল নেই-তলোয়ার নেই, নিধিরাম টুনি সর্দার। এরা আশ্বিন-কার্তিক মাসে বাসা বোনে তবে বসন্ত শেষে যখন কচি পাতাগুলো বেশ পুষ্ট সবুজ হয়ে ওঠে তখনও এরা বাসা বুনছে তা দেখেছি এমনকি বর্ষাকালে বিচালীগাদার তলায় বেড়ে ওঠা লম্বা ঝোপের পাতায় এদের বাসা দেখা গিয়েছে সুতরাং বলা যায় যে টুনটুনি বছরে ২/৩ বার বাসা বোনে। মাটি থেকে এক-দু-মানুষ উঁচুতে লাউ, ডুমুর, শিউলি, বাতাবীলেবু ও উঁচু বেগুনগাছে প্রধানত, দুটি বা তিনটি পাতা জুড়ে বাসাবোনে তবে বেশ বড়সর পাতা হলে একটিকেই মুড়ে সেলাই করে বাসা বোনে এরা। পাতার কিনারায় ঠোঁট দিয়ে ফুঁটো করে সরু শক্ত শুকনো ঘাস, আকন্দ-শিমুলতুলো, মাকড়সার জাল, পাটের আঁশ, পাখির লম্বা নরম পালক দিয়ে একটি পাতার সঙ্গে আরেকটি পাতা এমন চমৎকারভাবে সেলাই করে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টুনটুনিকে সেলাইয়ে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট পাইয়ে দিতে ইচ্ছা করে। এরা এমনভাবে বাসা তৈরি করে যেন সরাসরি বৃষ্টির ছাট্ না ঢোকে, রোদ না লাগে। বাসার ভিতরে গদি তৈরিতে কাশফুল, নরম ঘাষ তুলো ছোট্ট হালকা পালক কখনো বা গেরস্থের ছেঁড়া শুকনো কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করে। বাসা তৈরি হলেই দু-একদিনের মধ্যে স্ত্রী পাখি লালচে সাদা তাতে বাদামী ছোপ ছোপ দাগ বিশিষ্ট প্রায় গোলাকার ছোট্ট ছোট্ট ডিম পাড়ে। ডিমে মাঝে মধ্যে হালকা নীলাভ সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ টুনটুনি দুজনেই বিক্ষিপ্তভাবে ডিমে তা দেয়। ছোট্ট বুকে আরও ছোট্ট ছোট্ট ডিম পালক ফুলিয়ে চেপে ধরে রাখে দিনের পর দিন তারপর একদিন কচি কচি ছানারা ডিম ভেঙে বেরোয়, হাঁ করে খাবারও চাইতে পারে না ক-দিন। আর কটাদিন পর যখন বাচ্চারা হাঁ করে খাবার চায় তখন বাবা-মা আনন্দে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে টুন-টুন করে সকলকে জানান দিয়ে বনেবাদারে শিকার ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের মুখে পরম মমতায় পিঁপড়ের ডিম ও সবুজ লার্ভা তুলে দেয়। ছানারা গপ করে গিলে আবার হাঁ করে, ডানা কাঁপায়। তারপর ... সব্বার জানা আছে টুনটুনি আর বিড়ালের সেই গল্পটা কিভাবে মা-বাবা বড় করে বাচ্চাদের। কি ঠিক বলছি তো?

—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা

প্রকৃতি ও পরিবেশ কর্মশালা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বালিসাই জনবিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালনায় কাঁথি মহকুমার ৮টি স্কুলের প্রায় ২০০ ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে 'প্রকৃতি ও পরিবেশ' বিষয়ে এক কর্মশালা হয়ে গেল ১৭-১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রামনগর রাও হাইস্কুলে। কর্মশালায় বিজ্ঞানের নানান পরীক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার বিভিন্ন বিষয়, খাদ্যে ভেজাল, বিজ্ঞানের মজা প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে দেখানো হয় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়।

আবেদন

মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদানের অঙ্গীকার করুন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে ও অন্ধ মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে আপনার এই দান অমূল্য। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সাথে যোগাযোগ করুন।

✆ ২৫৮৫-৬০৯৪
বিজলী
পেপার এন্ড ষ্টেশনার্স
কে.জি.আর.পথ, (লক্ষ্মী সিনেমার বিপরীতে) কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

✆ 25890019(R)
SUBRATA DAS
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান

প্রাচীন যুগ (৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ — ১২০০ খৃষ্টাব্দ)

ইতিহাস পুস্তকে সাধারণভাবে আলোচিত বিষয়গুলির পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বিষয়টিও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। বর্তমান নিবন্ধে 'প্রাচীন যুগে ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান' বিষয়ে এক খণ্ডচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সভ্যতার উন্মেষ হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, মৃৎপাত্র, বাটখারা, মাপনী, অলঙ্কার, শীলমোহর প্রভৃতির বিচিত্র নক্সা, পরিকল্পনা ওই সভ্যতার মানুষের জ্যামিতি, পরিমিতি তথা বিজ্ঞানের বিচিত্র জ্ঞানের পরিচায়ক। সিন্ধু উপত্যকার ভারতীয়রা রসায়নবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, কারিগরী বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বৈদিকযুগের মানুষ গণিত চর্চা করতেন। সে যুগে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। সমসাময়িক কালের চীন ও মিশর দেশের জ্যামিতির তুলনায় ভারতীয় জ্যামিতি উন্নত ছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন 'It should never be forgotten that the world owes its first lessons in geometry, not to Greece, but to India.' পাটিগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ নির্ণয়, বর্গমূল নির্ণয় প্রক্রিয়াগুলি আলোচিত হয়েছে। অমূলদ ও সামান্য ভগ্নাংশের ব্যবহারও ভারতীয়রা জানতেন। তাঁদের বীজগাণিতিক জ্ঞানের পরিচয় শুল্ক সূত্রগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোনও এক সময় ভারতীয়রা দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতি এবং 'শূন্য' এই সংখ্যাটি আবিষ্কার করেন। সমগ্র বিশ্বে গণিত তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুই আবিষ্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। একে গণিতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক আবিষ্কার বলে গণ্য করা হয়। হুপার হিন্দু অঙ্ক পাতন পদ্ধতিকে 'The new and revolutionary method' বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে ভারত গণিতচর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। পরবর্তী ৭০০ বছরে জন্মগ্রহণ করেন আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর আচার্য, মহাবীর, ভাস্করাচার্যের মতো গণিতবিদ। গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় এঁদের অবদান সমগ্র বিশ্ব সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে।

জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। পৃথিবী যে গোলকের আকারবিশিষ্ট একথা 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয়রা রাশিচক্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আকাশে সূর্যের আপাত গতিপথ (Ecliptic) কে বৈদিক সাহিত্যে 'রবিমার্গ' বা 'ক্রান্তিবৃত্ত' বলা হতো। চন্দ্রের যে নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোতেই যে সে আলোকিত একথা তাঁরা জানতেন। তাঁরা সূর্যের বিষুব ও অয়নান্ত পরিক্রমা লক্ষ্য করতেন। পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ের পদ্ধতি তাঁদের জানা ছিল। 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এ পৃথিবীর ব্যাসের মান দেওয়া আছে। ১৬০০ যোজন। (১ যোজন = ৫ মাইল ধরা হতো)। তাঁদের পাঁচটি গ্রহের কথা জানা ছিল। প্রদ্যুম্ন মঙ্গল ও শনি গ্রহ এবং বিজয় নন্দী বুধ গ্রহ সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করেন। দিন বা রাতের প্রহরে প্রহরে আকাশে নক্ষত্রদের যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখা যায়, তার কারণ আসলে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন। আর্যভট্ট এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একথা তাঁর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি হিন্দু জ্যোতিষে 'ঔদয়িক' ও 'আর্ধরাত্রিক' নামে দুটি গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করার্যের রচনায় লম্বনের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'কাল সমীকরণ' (Equation of time) নামে যে ধারণাটি ব্যবহার করা হয়, বেদোত্তর যুগের ভারতবাসীরা সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার বিষয়টিকে অবহেলা করা যায় না। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আত্রেয়-এর প্রচেষ্টায় তাঁর ছাত্র জীবক, অগ্নিবেশ গবেষণা করে ভেষজ চিকিৎসা এবং শল্য চিকিৎসার প্রসার ঘটান। পরবর্তীকালে চরক ও সুশ্রুত চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে পশুচিকিৎসার উন্নতি হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অশোকের সময়ে চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যা প্রসার লাভ করে।

প্রাচীন ভারতে রসায়নচর্চা বিষয়টিও উল্লেখের দাবী রাখে। পারদ রসায়ন ও তার বহুল ব্যবহার প্রমাণ করে রসায়ন চর্চার ব্যাপকতা। সেকালে রসায়নবিদ্‌দের মধ্যে ৭০০ খৃষ্টাব্দের নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য।

লৌহ সম্পর্কিত বিজ্ঞান সেকালের ভারত জানতো। দিল্লী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের লৌহ স্তম্ভগুলি সেকথা প্রমাণ করে। লৌহ ছাড়া দস্তা, তামা সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ছিল। তক্ষশীলায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পিতলের পাত্র পাওয়া গেছে। এই পিতল তামা ও দস্তার মিশ্রণের বিগলনেই তৈরি করা হয়েছিল।

নবম শতাব্দীতে মহম্মদ-ইবন-মুসা-আল খোওয়ারিজমি আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তিনি ভারতীয় জ্যোতিষ, অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও বীজগণিত সম্বন্ধে 'কিতাবুল-হিন্দ' এবং 'আলজেবর-ওয়ালা মুকাবলা' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে আবু রেহান-মহম্মদ-আল ইরন-আজমেদ আলবেরুনি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা বিশারদ। তিনি গজনি ও ভারতবর্ষের নানা স্থান জুড়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রতিভার পরিচয় রাখেন।

প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

—গোবিন্দ দাস

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি,
একে বাঁচান।

বিষাক্ত সেলফোন

১ পাতার পর

হাতের মুঠোয়। ছেলে কলেজ থেকে ফিরছে হঠাৎ মায়ের ফোন—এখন কোথায়? উত্তর—ট্রেনে। বুক পকেট থেকে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের সেলফোন হাতে এলো তাতে তার জীবনসঙ্গিনী ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন। বান্ধবীকে নববর্ষে শুভেচ্ছা তাও সেলফোন থেকে। দেখতে দেখতে ভাবি 'তোমার খোকা কিচ্ছু জানে না মা, তোমার খোকা বড্ড ছেলে মানুষ।' কিন্তু আমি কেন এই কথা বলছি। এর মূলে রয়েছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স। ১৯৯২ সালে IEEE সেলফোন জাতীয় কম শক্তি বিকিরণকারী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেটি হচ্ছে :

যদি ৯০০ MHz বিকিরিত শক্তি ৭০০ Mw হয় তবে সেলফোনটিকে মানব দেহ থেকে ২.৫ সেমি দূরে রাখলে মানুষ নিরাপদে থাকবে। কিন্তু কোথায় আমরা সেই দূরত্ব মেনে চলি। কথা বলার সময় যত পারি কানের সঙ্গে লাগিয়ে রাখি। এবং সেটিকে বুকপকেটে হৃদয়ের যত কাছাকাছি রাখি ততই আমাদের রিং শুনতে সুবিধা হয়।

কিছুদিন আগে জাপানে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিমানা হিরাটা, মিনিঞ্চি মাৎসুয়ামা এবং তোশিয়ুকি শিওজায়া ৬০০ MHz - ৬ GHz তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ থেকে মানুষের মাথায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন। তাতে বিশেষ করে চোখের যে পরিবর্তন হয় তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। যাদের চশমা নেই তাদের চশমা লাগে এবং যাদের চশমা আছে তাদের পাওয়ার বৃদ্ধি পায়। সবথেকে বড় ভয় হচ্ছে চোখে ছানি পড়তে পারে। এর প্রধান কারণ এই বিকিরণের ফলে চোখে একটি 'Hot Spot' তৈরি হয়। যদি মাথায় টিউমার থাকে তবে তার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে। আর ক্যান্সার থাকলে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আমেরিকার আদালতে এই বিষয়ের উপরেই একটা মামলা হয়েছিল — ডেভিড রোনাল্ড তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই অভিযোগ করেছিল—সেল ফোনের বিকিরণেই তাঁর স্ত্রীর মস্তিষ্কের ক্যান্সারের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে। এই নিয়ে আমেরিকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সেলফোনের মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার কমিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

তাই যখন আমার বন্ধু জানায় যে তার অফিস থেকে তাকে একটা সেলফোন ব্যবহার করতে দিয়েছে তখন আমি ভাবি এই বুঝি তার শারীরিক অসুস্থতার দিন ঘনিয়ে এল। তা হলে কি সেলফোন ফেলে দেব? না 'জেনেশুনে বিষ পান' করব? আমরা নিশ্চই চেষ্টা করব যাতে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স যতটা পারি দূরে রাখতে। যত কম সম্ভব সেলফোন ব্যবহার করব। বাড়িতে DOT ফোন থাকলে সেলফোন ব্যবহার করব না, সেল ফোনের প্রয়োজন কমাব।

সেখানে ২.৫ সেমি দূরে রাখলে ফোনের আওয়াজ শোনা যায় না সেখানে নিজের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন করে অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করব যাতে IEEE সাবধানতা বহাল রাখতে পারি। চেষ্টা করব আমাদের চোখ এবং মাথা থেকে দূরে রাখতে। যাদের মাথায় টিউমার, ক্যান্সার আছে তারা সেলফোন কখনো ব্যবহার করবেন না।

আমি দেখেছি বেশিরভাগ চলমান দূরভাষ বাহক বুককেটে তা রেখে থাকেন, তাতে বুকে ব্যথা হয়। আবার বুকে ব্যথা না হলে যে সারা দিন রাত বুকে রাখব তা ঠিক নয়। কারণ, তা হৃদয় ভাঙার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন কোনও আঠা দিয়ে তাকে জোড়া যাবে না। কোমরের বেল্টের সঙ্গে রাখা সব থেকে বেশি বিজ্ঞানসম্মত।

৩০ সেমি লম্বা ২০ সেমি প্রশস্থ এবং ১৪ সেমি গভীর একটি প্লাস্টিক বাক্স নুন জল (নুনের পরিমাণ ৭ শতাংশ) পূর্ণ করে সেলফোন দিয়ে বিকিরণে তার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ২ সেমি থেকে ১০ সেমি দূর পর্যন্ত যা প্রভাব পরে তা অকল্পনীয়। বিশেষ করে পেসমেকার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার স্বাভাবিক কাজ ব্যহত হয় ফলে হৃদযন্ত্রটি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। যাদের পেসমেকার রয়েছে তারা সেলফোন ব্যবহার করলে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

এতক্ষণ যা বলা হল সবই Hand Set এর কথা। কিন্তু সেলফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবস্থায় উচ্চতরঙ্গের বিকিরণের দুটি উৎস একটি Hand Set আর অপরটি মোবাইল ফোন ব্যবস্থার বেস ও মাষ্টার স্টেশনের অ্যানটেনা। এই ব্যবস্থা ছোট ছোট সেলে ভাগ করা হয় কতজন ব্যবহার করছে তার উপর নির্ভর করে, ফলে শহরে কম শক্তির বিকিরণ করলে গ্রামে বেশি শক্তি বিকিরণ করতে হয়। ফলে গ্রামে Hand Set ও বড় নিতে হয়। আমরা বায়ু, জল, দূষণ থেকে দূরে পালাতে গ্রামে গেলে এই অজানা দূষণের মধ্যে থেকে আমরা রেহাই নেই। সুতরাং শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে বাঁচবেন, ভয় তো সেখানে আরও বেশি।

—সুদীপ দাস

জীবাণু যুদ্ধ

১ পাতার পর

সাথে ব্যবহৃত জীব বদলেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ১৩৪৬ সালে টার্টার সৈন্যরা কাফ্‌ফা আক্রমণের কালে প্লেগে মৃত শবদেহ শহরে ভিতরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ১৭৬৩-৬৭ সালে আমেরিকাতে ব্রিটিশ সেনাপতিরা স্মল পক্সের জীবাণু দ্বারা দূষিত কম্বল আদিবাসীদের দান করেছিল। খুঁজলে এইরকম উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে। জার্মান বিজ্ঞানী অ্যান্টন ডিগলার আমেরিকাতে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু উৎপাদন শুরু করেন এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেন। বিশ্বজুড়ে আতঙ্কময় পরিবেশে ১৯২৫ সালে জেনিভা চুক্তিতে জীবাণু যুদ্ধ বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু চুক্তিই হয় জীবাণু যুদ্ধ বন্ধ হয় না। গোপনে গবেষণা চলতে থাকে। এবিষয়ে অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে ১৭টি দেশ জীবাণু যুদ্ধ চালাতে সক্ষম। আক্ষেপের বিষয় এই তালিকায় ভারতবর্ষও আছে।

বর্তমানে সরকারিভাবে ছটি রোগের জীবাণু বা ক্ষতিকারক পদার্থকে জীবাণু যুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ছটি হল—অ্যানথ্রাক্স, স্মল পক্স, রাইসিন, বটুলিনাম, নিউমোনিক প্লেগ এবং টুলারেনসিস। অ্যানথ্রাক্স এর জীবাণু দুধরনের হয়। একটির আক্রমণে চামড়ায় র‍্যাশ হয়। দ্বিতীয়টি অধিক ক্ষতিকারক। এর আক্রমণে ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুও ঘটে। এই জীবাণুর প্রতিরোধক হিসাবে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। তবে ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু না হলে দুই দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। রাইসিন একধরনের বিষ, যা পাওয়া যায় ক্যাস্টর বিন থেকে। এই বিষের কোনও প্রতিষেধক নেই। ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক জীবাণু পচা খাবারের মাধ্যমে বিস্তারলাভ করে। বটুলিনাম সংক্রমণে স্নায়ুর ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে পক্ষাঘাত দেখা দেয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। প্রতিকার থাকলেও চিকিৎসা চলাকালীন শতকরা ২৫ জনের মৃত্যু ঘটে। টুলারিমিয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব সব থেকে কম। প্লেগ এবং স্মল পক্সেরও প্রতিষেধক বর্তমান। জীবাণু যুদ্ধে এই ছটি জীবাণু ও রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও ক্ষতিকারক

এরপর ৬ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

নির্দিষ্ট জীবনচক্র আছে। আমাদের পরিচিত প্রায় সব কৃমি প্রাণীদের দেহে থাকে, বড় হয় এবং জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। সংক্রমণের মাধ্যমে কৃমি কোনও একজন মানুষের দেহ থেকে অন্য আর একজন মানুষের দেহে প্রবেশ করে। কৃমির লার্ভা খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে মানুষকে সংক্রামিত করে। এছাড়া কিছু কৃমি কখনো কখনো পা দিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। সুতো কৃমি (Thread Worm) সোজাসুজি কিংবা সংক্রামিত খাদ্যের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। ফিতাকৃমি (Tape Worm) পশু (মূলত শুকর) থেকে মানুষে সংক্রামিত হয়। সুতরাং কৃমির সংক্রমমের জন্য মিষ্টি জিনিসের কোন প্রয়োজন হয় না। আরও বলা যেতে পারে কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধের সঙ্গে তিতোর কোন সম্পর্কই নেই। কোন একজন মানুষ একেবারেই মিষ্টি খায় না তবুও তার দেহে কৃমির সংক্রমণ ঘটতে পারে। আবার প্রচুর পরিমাণে তিতো খেলেও কৃমির সংক্রমণ ঘটতে পারে। মিষ্টি খেলে কৃমির সংক্রমণ বাড়ে এবং তিতো জিনিস খেলে কমে এটা একটা ধারণা মাত্র। কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চাই সচেতনতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। একমাত্র জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করলে কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

—শুভঙ্কর ঘোষ

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, হরিণঘাটা।

জীবাণু যুদ্ধ

৫ পাতার পর

রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়েছে। জীবাণু যুদ্ধে জীবাণুকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিশাল পরীক্ষাগারে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ লোকের সাহায্যে মিহি গুঁড়োতে পরিণত করা হয়। এই গুঁড়ো ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে বা বিমানের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জীবাণু যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিপদ হল আক্রমণের পরেও সহজে বোঝা যায় না কি ধরনের জীবাণু ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক পরীক্ষার পরে জীবাণুর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। ফলে আক্রমণের সাথে সাথে চিকিৎসা শুরু করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। আরও বিপদ হল জীবাণুর হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলেও বায়ু চলাচল হতে থাকলেই জীবাণু আক্রমণ করবে। ১৯৭২ সালে ১৪৯টি দেশ বায়োলজিক্যাল এন্ড টক্সিন ওয়েপন্স কনভেনশন-এ সই করে অঙ্গীকার করে জীবাণু যুদ্ধ সম্পর্কিত সব খবর সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবে। তবে অন্যান্য চুক্তির মতো এই চুক্তিও সম্পূর্ণভাবে পালিত হয়নি। আন্তর্জাতিক স্তরে জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুললে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পরিবেশ ভাবনা প্রথম পর্ব, আনন্দ লাল রায়।

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

আজ আমরা যাদের কথা শুনবো তাদের ১৯৫১ সালে লুপ্ত প্রাণী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আনন্দের কথা, ১৯৫৩ সালে এদের খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমানে এদের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি এবং গোটা পৃথিবীতে একমাত্র মনিপুরের লোকটাক হ্রদে এদের পাওয়া যায়। না ছাপার ভুল নয় হ্রদেই এদের বসবাস। হ্রদের জলজ গাছপালা জমে জমে ভাসমান দ্বীপের মতো হয়। স্থানীয় ভাষায় এই দ্বীপের নাম 'ফুমদিস'। হরিণরা এই ফুমদিসেই বসবাস করে। শুধু হরিণ নয় এই ফুমদিসে মানুষও বসবাস করে। বর্তমানে এই হরিণের বাসস্থানকে 'কেইবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান' নামে ডাকা হয়। এই দ্যাখো, এত কথা বলছি কিন্তু হরিণের নামটাই বলা হয়নি। এই হরিণের নাম সাংগাই হরিণ, বিজ্ঞান সম্মত নাম *Cervus eldi eldi*।

পূর্ণবয়স্ক সাংগাই হরিণ উচ্চতায় ১২০ সেমি হয় এদের শিং-এর দৈর্ঘ্য হয় ১০৭ সেমি এবং ওজন প্রায় ৯৫ - ১২০ কেজি হয়। পুরুষ হরিণের গায়ের রং গাঢ় বাদামী এবং স্ত্রী হরিণের রং হয় হালকা। হরিণ শিশুর গায়ে ছিটছিট দাগ থাকে। ভাসমান বাসস্থানে বসবাস করার জন্য সাংগাই-এর বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এদের পায়ের ক্ষুর চেরা এবং লম্বা। ফলে এরা সহজেই ভাসমান বাসস্থানে চলাফেরা করতে পারে। কাঁপতে থাকা ভাসমান বাসস্থানে চলাফেরা করার সময় এদের দেহে নাচের ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। তাই এদের মণিপুরের নাচুনে হরিণও বলা হয়। পুরুষ হরিণের সিং আগস্ট মাসের মাঝামাঝি খসে যায় এবং ডিসেম্বরের শেষাশেষি আবার সম্পূর্ণভাবে গজায়। সাংগাই হরিণ ছোট ছোট দল বেঁধে বসবাস করে। দিনের বেলা বিশ্রাম নেয় এবং সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় খাবারের খোঁজ করে। এরা ঘাস পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। বর্তমানে এই অদ্ভুত প্রাণীটি বিপদাপন্ন। কারণ এদের বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। এর সাথে আছে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ। লোকটাক হ্রদ আশেপাশের মানুষের জীবিকা সংগ্রহের স্থান হওয়ার দরুণ এদের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে অদ্ভুত বাসস্থানে বসবাসকারী এই অদ্ভুত প্রাণীটি লুপ্ত হতে পারে।

খবর

৪-১০-২০০৪ মগরা বনের মাঠ গ্রামে সবুজ গ্রাম উন্নয়ন সংঘে ৭৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে 'ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা'র সভ্যরা অলৌকিক নয় লৌকিক, খাদ্যে ভেজাল ও নানান অসুখের কুসংস্কার প্রথার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

• • • • • • • • • •

ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা পরিচালিত রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের দ্বিতীয় শিবির অনুষ্ঠিত হল ১৫-৮-২০০৪। শিবিরে সংস্থা পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করান। সংস্থার সম্পাদক দেবব্রত সেনের নেতৃত্বে সংস্থার সভ্যরাই রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেন। সংস্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন যায়গায় আরও শিবির করে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা বোঝান এবং কম খরচে গ্রুপ নির্ণয় করা।

অঙ্কের মজা

তোমরা নিশ্চয় লোকাল ট্রেনে মাঝেমাঝে যাতায়াত করেছো এবং সেখানে কখনও দেখে থাকবে একজন হকার একটা 'মজার অঙ্ক' বা 'অঙ্কে ম্যাজিক' জাতীয় বই বিক্রির জন্য তিনি একটি 'ম্যাজিক'ও দেখান। 'ম্যাজিক'টা এরকম—

একটা অঙ্ক তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে উত্তর শুনে তিনি বলে দেবেন তোমার ভাই-বোন ক'জন।

আমাদের আলোচনার আজকের উদ্দেশ্য হল প্রমাণ করা এটা 'অঙ্কের ম্যাজিক' না—এটা বিশুদ্ধ অঙ্ক।

তোমরা জান যে, দুই অঙ্ক বিশিষ্ট যে সংখ্যার এককের অঙ্ক Y ও দশকের অঙ্ক X সেই সংখ্যাটি হল $10x + Y$.

ধরো কোন শ্রোতার ক্ষেত্রে সে সবাই মিলে X জন ভাই ও Y জন বোন।

প্রক্রিয়াটা হল— প্রথম ধাপ : ভাই-এর সংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : গুণ ফলের সঙ্গে 3 যোগ করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : এই যোগফলকে 5 দিয়ে গুণ করতে হবে।

চতুর্থ ধাপ : এই গুণফলের সঙ্গে বোনের সংখ্যা যোগ করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ : শ্রোতার থেকে শেষ উত্তর শুনতে হবে।

এবার তুমি কি করবে?

প্রথম ধাপ উত্তর থেকে 15 বিয়োগ করো। ধরো বিয়োগ ফল 45। তাহলে দশকের অঙ্ক 4 হবে ভাইয়ের সংখ্যা ও 5 হবে বোনের সংখ্যা। আবার ধরো শ্রোতার সব হিসাবের শেষে উত্তর 62

তবে 62 - 15 = 47। তবে তারা 4 ভাই ও 7 বোন।

এটি অঙ্ক কেন?

ধরো, ভাইয়ের সংখ্যা X ও বোনের সংখ্যা Y ; প্রথম ধাপের পরে উত্তর হবে 2 X ; দ্বিতীয় ধাপের পরে উত্তর হবে 2 X + 3 ; তৃতীয় ধাপের পরে উত্তর হবে 5 (2X + 3) ; চতুর্থ ধাপের পরে উত্তর হবে 5 (2X + 3) + Y । এবার তোমার কাজ কি? এই উত্তর থেকে 15 বিয়োগ করা। সুতরাং তোমার উত্তর হবে {5 (2X + 3) + Y}-15 বা, (10X + 15 + Y) - 15 বা, 10 X + Y

বুঝতেই পারছ যে এটাই হল দু'অঙ্ক বিশিষ্ট সেই সংখ্যা যার একক স্থানের অঙ্ক Y ও দশক স্থানের অঙ্ক X

অর্থাৎ তোমার উত্তরের দশক স্থানের অঙ্কই হল ভাইয়ের সংখ্যা ও একক স্থানের অঙ্কই বোনের সংখ্যা। তাহলে 'ম্যাজিকটা' বিশুদ্ধ অঙ্ক হল তো?

তোমার দায়িত্ব হল তোমার জীবনে আসা সব 'অঙ্কের ম্যাজিককেই' বিশুদ্ধ অঙ্কে পরিণত করা। পারবে তো?

(এখানে বোনের কিংবা ভাইয়ের মোট সংখ্যা সর্বাধিক 9 হবে—এটা ধরে নেওয়া হয়েছে)

—শোভন বসু

কৌতূহল

এই বিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারে। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আমরা যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তব দেব।

(ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলি অপরিবর্তিত ভাবে ছাপানো হল)

প্র: পৃথিবীতে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় কেন?

পরমা কোনাই, মাদারপুর সুরবালা বালিকা বিদ্যালয়

উ: এককথায় পৃথিবীতে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ—সূর্যের চারিদিকে নিজ কক্ষপক্ষে পৃথিবী ও পৃথিবীর চারিদিকে নিজ কক্ষপথে চাঁদের প্রদক্ষিণ করার কারণে ঘটে থাকে। কিভাবে দুটি গ্রহণ ঘটে থাকে তা ব্যাখ্যা করা হল। তার আগে জেনে নেওয়া ভাল, সূর্য একটি নক্ষত্র ও নক্ষত্রের আলো আছে, আকার ও আয়তনে গ্রহদের তুলনায় অনেক বড় হয়। অর্থাৎ সূর্য একটি বিস্তৃত আলোক উৎস। বিস্তৃত আলোক থেকে সৃষ্ট ছায়া দুরকম হয় প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। আর পৃথিবী ও চাঁদ দুইই অস্বচ্ছ পদার্থ। আকার ও আয়তনে পৃথিবী, সূর্যের থেকে অনেক ছোট আর চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট।

চন্দ্রগ্রহণ : পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী ও চাঁদ যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের সাথে এক সরলরেখায় আসে এবং পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদের মাঝে অবস্থান করে; তখন চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া অঞ্চলে থাকলে চাঁদের পূর্ণগ্রহণ ও চাঁদ যদি উপচ্ছায়া অঞ্চলে থাকে তবে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ ঘটে।

পান্নালাল মনি, বিজ্ঞানকর্মী

প্র : পাথর ধারণ করলে অনেকক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যায়, অনেকক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান হয়। পাথর ধারণ করলে শারীরিক সমস্যা সমাধান হয়। এই পাথর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা কি?

বাসনা আচার্য, মাদারপুর সুরবালা বালিকা বিদ্যালয়

উ: রত্ন-পাথর ধারণ করলে শারীরিক সমস্যা যেসব ক্ষেত্রে সমাধান হয়, তা দুইভাবে হতে পারে। এক, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ও ওষুধ সেবনে; এবং দুই, কোন কোন কিছুই হয়নি অর্থাৎ সুস্থ লোকে পাথর ধারণ করলে সুস্থই থাকবে। শরীরে কোন সমস্যা অর্থাৎ রোগব্যাধি কেন হয়? সাধারণত: দুইটি কারণে আমাদের রোগব্যাধি হয়। প্রথমত: জীবাণুর সংক্রমণে ও দ্বিতীয়ত বিপাকের তারতম্যের ফলে। দুইটি ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ওষুধ খেয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ সারে। কোন ক্ষেত্রেই হাতের আঙুলে বা বাহুতে রত্ন-পাথর ধারণ করলে রোগ সারে না। কারণ রত্ন-পাথরের অবস্থান শরীরের বাইরে।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল—রত্ন-পাথরগুলি প্রকৃতপক্ষে কি। রত্ন-পাথরগুলি হতে পারে মৌলিক পদার্থ বা মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে জটিল যৌগ পদার্থ। যেমন হিরে রত্নটিকে জ্যোতিষীরা শুক্রগ্রহকে শান্ত রাখার জন্য করতে বলেন যা কার্বন মৌল দিয়ে তৈরি। পান্না রত্নটি কেতুকে শান্ত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, যে কেতুর কোন অস্তিত্ব নেই মহাবিশ্বে। এই 'পান্না' রত্নটি বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। গোমেদ আবার রাহুকে শান্ত রাখে, যে রাহুকেও মহাবিশ্বে খুঁজে পাওয়া যায় না। গোমেদের মৌলিক উপাদানগুলি হল : লোহা, ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম। প্রতিটি মৌলিক

এর পর ৮ পাতায়

খেলতে খেলতে বিজ্ঞান

বিজ্ঞানী হবে? বার করবে কোন তত্ত্ব? করতে চাও নাকি কিছু একটা আবিষ্কার? নিজেরাই? বেশ! তাহলে একটা প্ল্যাস্টিক বা পলিথিনের বোতল জোগাড় কর। বোতলের গায়ে একটা সেফটিফিন বা ছুঁচ দিয়ে ফুটো কর। ফুটোটা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে বোতলটা জল দিয়ে ভর্তি করে বোতলের মুখটা ভালোভাবে প্যাঁচ দিয়ে আটকে দাও। এবার তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করো—ফুটোর থেকে আঙ্গুল সরালে কী হবে? সবাই বলবে, ফুটো দিয়ে জল ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তুমি এরপর আঙ্গুলটা সরিয়ে নাও। অবাক হয়ে দেখবে, ফুটো আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জল পড়ছে না!

এবার একটা কাজ কর। আস্তে আস্তে বোতলের মুখটা খুলতে চেষ্টা কর। দেখবে, এবার ফুটো দিয়ে জল বেরোতে শুরু করেছে। মুখটা যেই বন্ধ করবে তখনই ফুটো দিয়ে জল বেরোন বন্ধ হয়ে যাবে। কেমন সুন্দর কল হল বলোতো? এই কল তোমার ইচ্ছামতো তোমার বন্ধুদের জল দেবে আর বন্ধও হয়ে যাবে।

এবার আর একটা খেলা বা পরীক্ষা বা আবিষ্কার। ছাদে দাঁড়াও। তোমার হাতে এখন একটা মুখ খোলা জল ভর্তি বোতল যার আবার গায়ে একটা ফুটো। স্বাভাবিক ভাবেই ফুটো দিয়ে জল পড়ছে! বন্ধুদের বল, নীচে দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে কী হয়?

এবার তুমি এক, দুই, তিন—বলেই বোতলটা হাত থেকে ছেড়ে দাও। সবাই অবাক হয়ে দেখবে বোতলটা যখন পড়ছে সেই পড়ার সময় ফুটো দিয়ে কোন জল পড়ছে না!

এবার আর একটা কাজ কর। জলভর্তি বোতলের মুখ খুলে বোতলটা উলটে দাও। নিশ্চয় খোলা মুখ দিয়ে জল পড়বে। এবার এই অবস্থায় বোতলটা ছেড়ে দিলে কী দেখবে বলতো? খোলামুখ দিয়েও কোন জল পড়ছে না যতক্ষণ ধরে বোতল পড়ছে!

ব্যাখ্যা : ১

বোতলের ফুটো থাকা সত্ত্বেও জল না বেরোনর কারণ বোতলের মুখ বন্ধ থাকায় জলের উপর বাতাসের চাপ এমন নয় যে ফুটোর বাইরের বাতাসের চাপকে হারিয়ে জলকে বাইরে বেরোতে দিতে পারে। এবার বোতলের ঢাকনি একটু একটু করে খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকছে এবং জলের উপর দিয়ে চাপ দিচ্ছে। তার ফলেই ফুটো দিয়ে জল বেরোচ্ছে। মুখ না খুলে জলভর্তি বোতলকে বাইরে থেকে চাপ দিলেও একই ঘটনা ঘটবে।

ব্যাখ্যা : ২

অবাধ পতনকালে সব বস্তু ওজন শূন্য হয়। ফলে তার চাপও শূন্য হয়। জলভর্তি বোতলটা যখন ওপর থেকে পড়ছে তখন তার ওজন শূন্য ফলে তার কোন চাপও নেই। আর চাপ না থাকলে ফুটো দিয়ে জল বেরোতে পারবে না। বোতলটা উলটো করে ফেললেও একই কাণ্ড হবে। বোতল এবং জল একই জোরে মাটির দিকে নামছে তাই জল বোতল ছাড়িয়ে পড়তে পারছে না। খোলা মুখেও মনে হচ্ছে যেন অবাধ পতনের ঢাকনি লাগানো আছে।

—সোমনাথ বসু

কৌতূহল

৭ পাতার পর

পদার্থই আমাদের শরীরে অল্পবিস্তর প্রয়োজন কিন্তু সেগুলি আমরা রত্ন থেকে সংগ্রহ করব এমন উপায় নেই। তাছাড়া এসব মৌলিক পদার্থগুলি আমরা খুব সহজেই শাকসব্জী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থেকে পেয়ে থাকি।

পান্নালাল মণি, বিজ্ঞানকর্মী

প্র : আমরা যদি ১০০ জনের হস্তরেখা বা কোষ্ঠী দেখিয়ে জ্যোতিষীদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জানতে চাই তবে তারা যে বক্তব্য রাখেন তার মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৩০-৪০ ভাগ মিলে যায়। যাদের মিলে যায় তাদের জ্যোতিষীদের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। এক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস থেকে কিভাবে বিজ্ঞানমুখী করানো যায়?

অর্চনা চক্রবর্তী, সুমিত্রা ব্যানার্জী
মাদারপুর সুরবালা বালিকা বিদ্যালয়

উ : এখানে প্রশ্নে যে পরিসংখ্যানটি দেওয়া হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জ্যোতিষীর হস্তগণনা বা কোষ্ঠীবিচার একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা শুধুমাত্র কাকতলীয় ভাবে মেলানোর খেলা মাত্র। এখানে স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে শতকরা ৬০-৭০ জনের ক্ষেত্রে জ্যোতিষবিদ্যা বিফলে যাবে।

আর যাদের ভবিষ্যৎ মিলে যায় তাদের প্রথমে জানতে হবে হাতে রেখা কেন হয়? হস্তরেখা কি ভবিষ্যৎ বলার জন্যই তৈরি হয়? না, ভবিষ্যৎ বলার জন্য হস্তরেখা হয় না। হস্তরেখা হবেই এবং এটা মানুষের অন্যান্য অঙ্গ তৈরির মতই ব্যাপার। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের দেহ থেকে হাত তৈরি হওয়ার সময় হাতের তালু থাকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়, তখন তালুর বড় হাড় ও আঙুলের ছোট ছোট হাড়ের দরুণ হাড়গুলির সংযোগ বরাবর ভাঁজ পড়ে। আস্তে আস্তে হাত মুঠো করলে দেখা যাবে মোটা রেখা বরাবর হাত ভাঁজ হবে।

অর্থাৎ হাতের রেখা আমাদের ভবিষ্যৎ বলার জন্য বা আমাদের পরিচয় বহন করার জন্য তৈরি হয় না। যদি তাই হত তবে সকলেরই ভবিষ্যৎ মিলে যেত (শতকরা ১০০ জনের)।

প্রকৃতপক্ষে হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলার কারণ হচ্ছে 'রত্ন - ব্যবসা'। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যদি ১০০ জনের হস্তরেখা বা কোষ্ঠীবিচার করি, তবে দেখা যাবে আনুমানিক ৯৯ জনের ক্ষেত্রে জ্যোতিষী কোন না কোন রত্ন বা পাথর দেবেন ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য। বোধ হয় হস্তরেখা পরিবর্তনের জন্য।

পান্নালাল মণি, বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার।

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.